অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 249-256
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.035

NABBOIYER DASHAKE TRIPURAR PROBONDHOCHARCHA / নব্বইয়ের দশকে ত্রিপুরায় প্রবন্ধচর্চা

PRASHANTA CHAKRABORTY / প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গবেষক,বাংলা বিভাগ,ধম্মাদীপা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়,সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ভারত
Email: prashantachakroborty19@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:

ত্রিপুরা, প্রবন্ধ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস

Abstract:

ত্রিপুরায় প্রবন্ধচর্চার সূচনা হয় রাজ আমলে। সে সময়ের রচনাগুলোতে আমরা ত্রিপুরার তৎকালীন সময়ের চিত্র দেখতে পাই। পরবর্তীতে সময় যতো এগিয়েছে, এ কাজে আরও এগিয়ে এসেছেন অনেকেই। আমাদের আলোচ্য বিষয় 'নব্বইয়ের দশকে ত্রিপুরায় প্রবন্ধচর্চা'। এই দশকের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক ছিলেন- জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল, রমাপ্রসাদ দত্ত, দীপক ভট্টাচার্য, সমর চক্রবর্তী, হিমানী চক্রবর্তী, সুমঙ্গল সেন, পান্না চৌধুরী, দেবাশিস পাল, রেখা রায়, রাখাল চন্দ্র চৌধুরী। তাঁদের মধ্যে প্রাবন্ধিক জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল ত্রিপুরার ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে ত্রিপুরার অনালোকিত নানা বিষয়। এদিকে প্রাবন্ধিক রমাপ্রসাদ দত্ত রচনা করেছেন অনেক সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। এর পাশাপাশি রবীন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় প্রাবন্ধিক দীপক ভট্টাচার্যের অবদানও উল্লেখযোগ্য ছিল। আর ভারতবর্ষের ইতিহাসের ৪২-এর আন্দোলনকে অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন প্রাবন্ধিক সমর চক্রবর্তী। এভাবেই একেক জন প্রাবন্ধিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় কলম ধরেছিলেন, যা ত্রিপুরার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

Discussion:

নব্বইয়ের দশকে ত্রিপুরায় যাঁরা প্রবন্ধচর্চার যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রাবন্ধিক জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল অন্যতম। প্রাবন্ধিক জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৪ সালে, ২০১৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাবন্ধিক জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল একজন সাংবাদিক ও স্বাধীনতা স্যংগ্রামী ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন ত্রিপুরারাজ্যের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'জাগরণ'-এর সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯২ সালে প্রাবন্ধিক জিতেন্দ্র চন্দ্র পালের একটি উল্লেখয্যেগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যার নাম 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত'। এই গ্রন্থে তিনি ত্রিপুরার ইতিহাসকে বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধ- 'ত্রিপুর রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি'। এই প্রবন্ধে তিনি ত্রিপুর রাজবংশেরর চিত্র তুলে ধরেছেন। জানা গেছে সর্মিষ্ঠার গর্ভে মহারাজ যযাতির দ্রুহ্য নামক পুত্রই ত্রিপুর রাজবংশের আদি পুরুষ। এই গ্রন্থের পরবর্তী প্রবন্ধটির নাম 'ত্রিপুরা, রাজন্যবর্গ ও রাজ-শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল উল্লেখ করেছেন ত্রিপরা রাজ্যের নামকরণের প্রসঙ্গ। জানা গেছে মহারাজ ত্রিপুর তাঁর নিজের নামানুসারে ত্রিপুরা রাজ্যের নামকরণ করেছিলেন।

এরপর প্রাবন্ধিক তাঁর এই প্রবন্ধটিতে চতুর্দশ দেবতার আবির্ভাব কীভাবে হয়েছিল ত্রিপুরার, সে প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। জানা যায় তৎকালীন সময়ে রাজ্যের অস্থিরতার অবসান ঘটানোর জন্য প্রজাদের আবেদনে, দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশে ত্রিপুরায় চতুর্দশ দেবতার আবির্ভাব ঘটেছিল। এর পাশাপাশি প্রাবন্ধিক উদরপুরের নামকরণের ইতিহাসও তুলে ধরেছেন। জানা গেছে মহারাজ উদয়মাণিক্য তাঁর নিজের নামানুসারে উদরপুরের নামকরণ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে আরও জানা যায় যে, উদরপুরের আগের নাম 'রাঙ্গামাটি' ছিল এবং এটাই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিল। এরপর প্রাবন্ধিক রাণী মহাদেবীর প্রসঙ্গ এনেছেন। প্রাবন্ধিক ত্রিপুরার এই রাণীর বীরাঙ্গনা স্বভাবের প্রশংসা করেছেন বার বার। মহারাজ সিংহতুঙ্গ যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন ত্রিপুরায়, তখন গৌড়ের নবাবের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। গৌড়ের নবাবের প্রায় দুই/তিন লক্ষ সৈন্য ত্রিপুরার সীমান্তে হানা দিলে, ত্রিপুরার মহারাজ ভয় পেয়ে গৌড়ের নবাবের সাথে সন্ধির কথা ভাবে। এদিকে সিংহতুঙ্গের এমন ভাবনার কথা মহারাণীর কানে গেলে তিনি ক্ষেপে উঠে মহারাজকে বলেন-

"হে নরনাথ, তুমি একি কথা বলছ? পূর্বপুরুষের কীর্তি লোপ করতে চাও? ছিঃ ছিঃ! যদি নবাবের সৈন্য দেখে ভয় পেয়ে থাক তবে অন্তঃপুরে আরামে বাস কর, আমি রণে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"[১]

এই বলে পরক্ষণেই তিনি দামামা বাজিয়ে সৈন্যদের সাথে কথা বলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মহারাণীর সাথে মহারাজাও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পরবর্তীসময় এবং যুদ্ধে ত্রিপুরার রাজা ও রানীর জয় হয়েছে বলে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। এরপর প্রাবন্ধিক জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল আগরতলার নামকরণের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন যে, মহারাজ সিংহতুঙ্গের পরবর্তী চতুর্থ পুরুষ মহারাজ হরিরায়ের(ডাঙ্গরফার) ১৮টি পুত্র ছিল। এই ১৮টি পুত্রকেই মহারাজ হরিরায় রাজ্য পরিচালনা করার দ্বায়িত্ব দেন এরমধ্যে আগরতলার শাসনভার দেন পুত্র আগরফাকে। জানা যায়, এই আগরফার নামানুসারেই আগরতলার নামকরণ করা হয়। আবার লোকমুখে এও শোনা গেছে যে, আগর বন থেকেই আগরতলার নামকরণ হয়েছিল। এরপর প্রাবন্ধিক তাঁর 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা করেছেন। যেমন- ত্রিপুরাসুন্দরী মাতা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, উদরপুরের জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ, কসবার কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা, ইংরেজ শাসনের সূচনা, আগরতলায় রাজপাট, ত্রিপুরায় চা-বাগান, গুণগ্রাহী বীরবিক্রম -ইত্যাদি বিষয়ে প্রাবন্ধিক জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল অনেক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন, যা প্রশংসনীয়।

নব্বইয়ের দশকের আরেকজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক রমাপ্রসাদ দত্ত। তাঁর রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'ত্রিপুরার একটি মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি চম্পক বিজয়'। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ত্রিপুরার তৎকালীন ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন ত্রিপুরার রাজাদের কাহিনি অবলম্বন করে যে কয়টি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে 'চম্পক বিজয়' নামক পুঁথিটি অন্যতম। এই 'চম্পক বিজয়' কাব্যের কবি লেখ মহদ্দিন। কাব্য রচনাকাল নিয়েও স্পষ্ট কিছু লেখা নেই। তবে এতটুকু জানা গেছে যে, যেহেতু মীর খাঁর আদেশে এই কাব্য লেখা, তাই মীর খাঁর সময়কালকে ধরা যেতে পারে।

কবি শেখ মহদ্দিন তাঁর 'চম্পক বিজয়' নামক কাব্যটি 'দেব বন্ধনা' দিয়ে শুরু করেছিলেন। সে সময়কালের নানা জটিলতাপূর্ণ ইতিহাসের ছাপ এ কাব্যে স্পষ্ট। যদিও আখ্যান কাব্য হিসেবে এই কাব্যটি সার্থকতা লাভ করেনি। কারণ অত্যন্ত দুর্বল ছিল এটির কাহিনি। কবি করেকটি চরিত্র নিয়ে এ কাব্যে নাড়াচাড়া করেছেন মাত্র। চরিত্রগুলোর জীবনের বিশেষ দিকগুলোকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। তবে একথা মানতেই হবে যে, উপমাসহ বিভিন্ন অলংকারের ব্যবহারে কবি শেখ মহদ্দিন পারদর্শী ছিলেন। এখানে তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। প্রাবন্ধিক রমাপ্রসাদ দত্ত এ কাব্যের ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রাখলেও ঐতিহাসিক কাব্য হিসেবে এটির গুরুত্ব রয়েছে বলে জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি প্রাবন্ধিক আরও জানিয়েছেন যে, তৎকালীন সময়ে রাজা বা সভাসদদের জীবনে কতো দ্রুত ভাগ্য বিপর্যয় উপস্থিত হতো -এই চিত্র কবি শেখ মহদ্দিন খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'চম্পক বিজয়' নামক কাব্যে। শুধুমাত্র তা-ই নয়, রাজাদের সিংহাসন যে কতো ষড়যন্ত্রের মধ্যদিয়ে হস্তান্তরিত হয়, এই ছবিও কবি শেখ মহদ্দিন দক্ষ শিল্পীর মতোই এঁকেছেন। ড. সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যটি সম্পর্কে তাঁর 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা' গ্রন্থে বলেছেন-

"ঐতিহাসিক রচনা হিসাবে চম্পক বিজয়ের অসামান্যতা স্বীকার করিতে হয়।....."[২]

রমাপ্রসাদ দত্তের পর এবারে যাঁকে নিয়ে আলোচনা করা হবে, তিনি প্রাবন্ধিক দীপক ভট্টাচার্য, জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৫৩ খ্রি.। নব্বইয়ের দশকে তাঁর প্রবন্ধচর্চা ত্রিপুরার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাবন্ধিক দীপক ভট্টাচার্যের লেখা একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'ঘরে বাইরে উপন্যাস, সাহিত্য বনাম চলচ্চিত্র।' এই প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটির সাথে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চিত্ররূপের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের মূখ্য তিনটি চরিত্র নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ। নিখিলেশকে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন আদর্শবাদী পুরুষ হিসেবে। আর নিখিলেশের স্ত্রী বিমলা ও রাজনৈতিক কর্মী সন্দীপকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে মানুষজন তাদেরকে ঘৃণার চোখেই দেখেছে। প্রাবন্ধিক দীপক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অবলম্বনেই 'ঘরে বাইরে'(১৯১৬) নামক উপন্যাসটি লিখেছিলেন। তৎকালীন সময়ে দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল এবং এর পাশাপাশি মধ্যবিত্ত পরিবারে ভাঙ্গন, দেশপ্রেমের নামে যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এর-ই চিত্র তুলে ধরেছিলেন। এই উপন্যাসে নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার সাথে দেশপ্রেমে মত্ত যুবক সন্দীপের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এইজন্যে রবীন্দ্রনাথকে অনেক নোংরা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় এই উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিয়ে সমালোচনার নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন-

"...সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো সন্দীপকে উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে মুক্তি দিয়ে যুগোপযোগী করে তোলা।"[৩]

প্রাবন্ধিক দীপক ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রবন্ধে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটির আরও একটি প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছিলেন। তৎকালীন সময়ে দেশপ্রেমে মত্ত যুবকেরা স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে ইংরেজ খুনে মেতে উঠেছিল। এর ফলস্বরূপ অনেকেই দন্ড ভোগ করেছিল। ইতিহাস থেকে এই দিনগুলো কখনোই মুছবে না বলে জানিয়েছেন প্রাবন্ধিক।

এবারে আলোচনা করা হবে প্রাবন্ধিক সমর চক্রবর্তীর প্রবন্ধচর্চা নিয়ে। সমর চক্রবর্তী ত্রিপুরার প্রবন্ধসাহিত্য চর্চার এক উল্লেযযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত একটি গুরুত্বপূর্ন প্রবন্ধ '৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট'। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন ভারতের ইতিহাসের ১৯১৯-এর ঘটনা। পাশ হয় রাওলাট আইন। পাঞ্জাবের জালিয়ান-ওয়ালাবাগে হত্যাকান্ড হলো সাহেবদের দ্বারা, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল ডায়ার। এর পাশাপাশি ব্রিটিশদের অত্যাচার ও বর্বর আচরণ ছিল সহ্যের বাইরে। ঠিক তখনই মহাত্মা গান্ধী জাতীয় আন্দোলনের সামনে এলেন। ফলস্বরূপ শুরু হলো আইন আামান্য আন্দোলন, খিলাফৎ আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন। এর পাশাপাশি ডান্ডি অভিযানও শুরু হয়েছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। এদিকে বিশ্ব রাজনীতি ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হতে শুরু করেছিল। মিত্রশক্তি হিসেবে জাপান, জার্মান ও ইতালী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে। কারণ ব্রিটিশের একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল সিঙ্গাপুর। এটি যদি জাপানী সৈন্যের দ্বারা আক্রমণের স্বীকার হয়, তবে ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে উঠতে পারে। তাই গান্ধিজী ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদেরকে চলে যেতে বলেছিলেন। এদিকে ব্রিটিশের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ভারতে আলোচনার জন্য স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে পাঠালেন। ক্রীপসের প্রস্তাব পড়ে গান্ধিজী বলেছিলেন-

"It is a post-dated cheque on a crashing bank."[৪]

এতে সন্তুষ্ট হলো না কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ। উভয়েই ব্রিটিশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। এদিকে জাপানের সৈন্যরা ভারতের সীমান্তে চলে এলে গান্ধিজী আরও জোরালোভাবে 'ভারত ছাড়' জান্দোলনের ডাক দেন। এদিকে ব্রিটিশরা গান্ধিজীসহ আরও অনেক নেতাকে কারারুদ্ধ করলে জনতা ক্ষেপে উঠে। ঠিক তখনই ব্রিটিশ সৈন্য ভারতীরদের উপর গুলিবর্ষণ করে। পরবর্তীতে ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হয়। প্রাবন্ধিক সমর চক্রবর্তী তাঁর এই প্রবন্ধে মূলত এটাই বলতে চেয়েছেন যে, 'ভারত ছাড়' অন্দোলনই আমাদের স্বাধীনতাকে আরও কাছে নিয়ে এসেছিল।

এই দশকের আরেকজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক হিমানী চক্রবর্তী। তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র রচনায় অধ্যাত্ব চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ'। প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক হিমানী চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন রচনায় আধ্যাত্মিক ভাব কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক 'রক্তকরবী' নাটকের প্রসঙ্গ এনেছেন। নাটকাটির মধ্যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী রাজা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। প্রাবন্ধিক এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যা ক্ষণিকের, তার মধ্যে সুখ খুঁজে লাভ নেই। এরপরও আমাদের মন এই ক্ষণিকের বিষয়গুলোর মধ্যেই শান্তির সন্ধান করে বেড়ায়। শুধুমাত্র নাটকে নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত অসংখ্য কবিতাতেও তাঁর অধাত্ম চেতনার প্রকাশ ঘটেছে বলে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বার বার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, যেন তাঁর বাসনাগুলো জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক হিমানী চক্রবর্তী তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে বলেছেন যে, আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা যদি দু'নৌকায় পা রেখে চলি, তবে কোনও ফললাভ হবে না। তাঁকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে পেতে হলে পুরো ষোলো আনা মন দিয়ে ডাকতে হবে, ভালোবাসতে হবে। প্রাবন্ধিক আরও উল্লেখ করেছেন যে, ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তের ভালোবাসার কাঙাল। ভক্তের মধ্যেই ঈশ্বর

নিজের আনন্দ খুঁজে পান। ভক্ত যদি ভগবানের দিকে একটু এগিয়ে আসেন, তবে ভগবানও এগিয়ে আসেন তাঁর ভক্তকে বুকে জড়িয়ে নেওয়ার জন্যে। এরপর প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন, যা অনস্বীকার্য। কথাটি এই যে, ঈশ্বর অথবা ভগবানকে লাভ করার ক্ষেত্রে আমাদের সবথেকে বড় বাধা হচ্ছে অহংকার। তাই সর্বপ্রথমে আমাদেরকে অহংকার ত্যাগ করতে হবে বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন।

এবারে যাঁকে নিয়ে আলোচনা করা হবে, তিনি সুমঙ্গল সেন। তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'সুন্দরের সান্নিধ্য : রূপারোপের অনন্তানুসন্ধান'। এই প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সুমঙ্গল সেন অনেকের প্রসঙ্গ এনেছেন। রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কীটস্-এর দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেছেন তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক ছিলেন। আমাদের আরাধ্য লক্ষ্মীদেবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে, লক্ষ্মীদেবী শুধুমাত্র ঐশ্বর্য ও সুন্দরের দেবী নন, তিনি মঙ্গলেরও দেবী। আবার ইংরেজি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি কীটস্ তাঁর কবিতায় সত্য ও সুন্দরকে এক করে দেখালেন। কবি কীটস্-এর কাছে আমাদের জগতে যা কিছু সত্য আছে, এগুলো সবই সুন্দর এবং সুন্দর যা কিছু, সবই সত্য। এরপর প্রাবন্ধিক সুমঙ্গল সেন তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের 'ডুবু ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে' নামক বিখ্যাত গানটি সর্ম্পকে দু'চার কথা বলেছেন। এখানে লেখক আমাদেরকে রূপসাগরে ডুবে প্রেমরত্ন ধন সংগ্রহ করার কথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পরে প্রাবন্ধিক মধ্যযুগের একজন অন্যতম বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছিলেন। জ্ঞানদাস ছিলেন চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা। তাঁর রচিত বিখ্যাত পদগুলো এখনও বহুলচর্চিত। এরপর প্রাবন্ধিক মহাভারতের কথা তাঁর আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসেন। মহাভারতের যুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপান্ডবদের মধ্যে তাঁর প্রিয় অর্জুনকে বিশ্বের রূপ দেখিয়েছিলেন। এই রূপ দেখানোর আগে অর্জুনকে তিনি দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন। মহাভারতের প্রসঙ্গের পর প্রাবন্ধিক আরেকজন শিল্পীকে তাঁর আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিল্পীর, সাধকের দৃষ্টি হতে হবে দিব্যদৃষ্টি, এই মত ছিলো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এভাবেই প্রাবন্ধিক তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ করেছিলেন, যা প্রশংসার যোগ্য।

নব্বইয়ের দশকের ত্রিপুরার আরেকজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক পান্না চৌধুরী। ডম্বুর অঞ্চলকে নিয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধ 'ডম্বুরে জুমিয়াদের বিকল্প জীবিকার উদ্যোগ'। প্রাবন্ধিক পান্না চৌধুরী তাঁর রচিত এই প্রবন্ধে জুমিয়াদের জন্য জুম ব্যতীত আরও কিছু জীবিকার কথা উল্লেখ করেছেন। জুমিয়ারা সেখানকার টিলাভূমিতে জুম চাষ করে আর মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করতো। ফলস্বরূপ টিলাভূমি দিনের পর দিন ক্ষয় হতে থাকে এবং জলাশয়ের গভীরতা কমতে শুরু করে। এমন অবস্থায় ত্রিপুরা সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের প্রধানরা যতনবাড়ীস্থিত রাইমা পর্যটক আবাসে একটি আলোচনায় বসে। সেখানে ডম্বুর ও তার পাশ্ববর্তী এলাকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে নানা বিষয় উঠে আসে। এর পাশাপাশি উঠে আসে কিছু বিকল্প জীবিকার চিন্তাধারা। পরবর্তী সময় এগিয়ে আসে কৃষি ও পশুপালন বিভাগের কর্মকর্তারা। উনারা মন্দিরঘাট থেকে নারকেল কুঞ্জের মধ্যে চারটি দ্বীপ বেছে নিলেন কাজের জন্য। কাজের সময় তিন বছর নির্দিষ্ট করা হলো। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ফসল ফলানোর সিদ্ধান্ত করা হলো। এর পাশাপাশি চাষাবাদের কাজে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের জন্য দুই জন গ্রাম সেবক কর্মীকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ করা হলো। জুমিয়াদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে পাশুপালন দপ্তরও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। পশুপালন দপ্তরের মতানুসারে জুমিয়াদের মধ্যে শূকর ছানা, মুরগীর বাচ্চা ও হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এ ব্যাপারে দপ্তরের কর্মীদের সুদূরপ্রসারী ভাবনা ছিল যে, শূকরের ছানাগুলো বড় হলে সেগুলো বিক্রি করে ঐ অঞ্চলের মানুষজনেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। তারা

স্বাবলম্বী হলে তাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে। এই প্রত্যাশাই রেখেছিল সরকার।

প্রাবন্ধিক পান্না চৌধুরীর পরে এই দশকে যাঁর সাহিত্যচর্চা উল্লেখযোগ্য, তিনি প্রাবন্ধিক দেবাশিস পাল। তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধ 'আন্দোলনের ইতিহাস, নতুন প্রজন্মের দিক-নির্দেশ'। প্রবন্ধটিতে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক দেবাশিস পাল প্রথমেই পলাশীর যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ব্রিটিশরা প্রায় দুইশত বছর আমাদের দেশে শাসন করেছিল। পলালীর যুদ্ধ(১৭৫৭)-এর পর থেকেই আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়েছিল। যদিও পলাশীর যুদ্ধের আগেই তারা আমাদের দেশে ব্যবসা করতে এসেছিল। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক আধিপত্য বৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল ব্রিটিশরা। এরপর প্রাবন্ধিক দেবাশিস পাল তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পটভূমি তুলে ধরেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই আন্দোলটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তাঁর নেতৃত্বে অগণিত মানুষজন এই অন্দোলনে জড়িয়ে যায়। তিনি 'হরিজন' নামক পত্রিকায় 'ভারত ছাড়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের মানুষের মুখে উচ্চারিত হয় 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। হ্যাঁ, এই লক্ষ্যেই সবাই এগিয়েছিল যে, হয় করবো, নয় মরবো। দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে সেদিন লক্ষ লক্ষ যুবক অগ্রসর হয়েছিল। এদিকে বাংলার মেদিনীপুর জেলায় পুলিশের গুলিতে জাতীয় পতাকা হাতে মাতঙ্গিনী হাজরা নিহত হলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারন করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে বিহারের ভাগলপুর ও উত্তর প্রদেশের বালিয়ায় আন্দোলন গড়ে ওঠে। সামরিক বাহিনী এই আন্দোলনগুলো দমনের চেষ্টা করলে অসংখ্য মানুষের প্রাণ যায়। এমনকি এই সামরিক বাহিনীগুলোর কাছ থেকে স্ত্রী জাতিও রক্ষা পায়নি।

এই দশকের আরেকজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক রেখা রায়। তাঁর রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র সাহিত্যের নির্যাসই বিশ্বমানবতা'। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক রেখা রায় তাঁর এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন রবীন্দ্র সাহিত্যে কীভাবে বিশ্বমানবতার কথা উঠে এসেছে। শুধুমাত্র তা-ই নয়, তৎকালীন সময়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ কতোটা এগিয়ে এসেছিলেন, এই চিত্রও প্রাবন্ধিক রেখা রায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর রচিত এই প্রবন্ধটিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনোই দেশ-জননী ও বিশ্ব-জননীকে পৃথক করে দেখাননি তাঁর রচিত সাহিত্য ও সঙ্গীতে। তাঁর কাছে নিজের দেশ এবং বিশ্ব, ঐক্য-সংহতির এপিঠ আর ওপিঠ। তাঁর মতে, আমরা কখনোই আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছাতে পারবো না, যদি আমরা আমাদের মানবতার খাঁচায় বিশ্বমানবতার চেতনাকে বেঁধে রাখি। বিশ্বমানবতা রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেওয়া-নেওয়ার কথা বলেছেন বারংবার। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্ধিক রেখা রায়ও তাঁর এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনেছেন। প্রাবন্ধিক বলেছেন 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীর থেকেও বেশি কিছু বোঝাতে চেয়েছেন। এরপর প্রাবন্ধিক রেখা তাঁর এই প্রবন্ধে খিলাফৎ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন। জাতীয় ঐক্য রক্ষার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন যখন বিশেষ কিছুই করতে পারছিল না, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধচর্চায় কলম ধরলেন। তৎকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'সমস্যা' ও 'সমাধান' নামে দু'টি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এরপর প্রাবন্ধিক রেখা রায় 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করে বললেন, বিশ্বমানবতার সুর রয়েছে এই কাব্যটিতে। শুধুমাত্র 'বলাকা'-তেই নয়, রবীন্দ্রনারের রচিত 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ এবং তাঁর বিখ্যাত 'গোরা' উপন্যাসেও বিশ্বমানবতার জয়গান করা হয়েছে বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন।

প্রাবন্ধিক রেখা রায়ের পর এবারে যাঁর প্রবন্ধচর্চা নিয়ে আলোচনা করা হবে, তিনি প্রাবন্ধিক রাখাল চন্দ্র চৌধুরী। তাঁর রচিত একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'নজরুল সাহিত্যে ও সংগীতে জন জাগরণ'। এই প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক

রাখাল চন্দ্র চৌধুরী নজরুলের জীবন এবং তাঁর রচিত সাহিত্য ও সংগীতের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। কবি-সাহিত্যিক-গীতিকার নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন ২৪মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে চুরুলিয়ার এক দরিদ্র পরিবারে। দারিদ্রতার কারণে তিনি বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারেননি। অল্প বয়সেই চাকরিতে যোগদান করেন, কিন্তু চাকরির স্থায়িত্ব বেশিদিন ছিল না। ফলে অন্যান্য কাজেও তিনি যুক্ত হন। লেখালেখির কাজে তিনি যুক্ত হন ১৯১৭ খ্রি. থেকে। তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর করুণ পরিস্থিতি, ইংরেজের দ্বারা ভারতীয়দের উপর অত্যাচার, জনগণের অন্ধ কুসংস্কার, নারী নির্যাতন যখন ভারতবর্ষের মানুষদেরকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল, ঠিক তখনই কলম হাতে নজরুলের আবির্ভাব হয়। নজরুলের রচিত সাহিত্য ও সংগীতগুলো ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছিল। নজরুলের এই প্রতিবাদী সত্ত্বাকে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার ১৯২৩ খ্রি. তাঁকে আটক করে রাখে হুগলী জেলে। জেলের মধ্যেও তিনি থেমে থাকেন নি। সে সময় জেল সুপারের নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জেলের ভেতরেই তিনি একটি প্যারোডি গান রচনা করেছিলেন। গানটি এমন-

"তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে....."[৫]

পরে ইংরেজ অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি জেলের ভেতরে 'এই শিকল পরা ছল' নামক গানটিও রচনা করেন। এরপর প্রাবন্ধিক রাখাল চন্দ্র চৌধুরী তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তৎকালীন সময়ে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার ক্ষেত্রে নজরুল রচিত সাহিত্য ও সংগীতের অবদান অনস্বীকার্য বলে প্রাবন্ধিক রাখাল চন্দ্র চৌধুরী মনে করেন।

উপরিউক্ত আলোচনার পর এই কথা বলা যায় যে, ত্রিপুরায় নব্বইয়ের দশকে অনেকেই প্রবন্ধ চর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের রচিত প্রবন্ধগুলো পাঠ করে আমরা তৎকালীন রাজ্য-রাষ্ট্র পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারি এবং আরও সমৃদ্ধ হতে পারি।

Reference:

(১) জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল, ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, সৈকত প্রকাশন, আগরতলা, পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৪, পৃ. ১০
(২) হীরালাল চৌধুরী(সম্পাদক), গোমতী, তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা,কার্ত্তিক ১৩৯৯, পৃ. ১
(৩) তদেব, পৃ. ১৯
(৪) তদেব, পৃ. ২৭
(৫) হীরালাল চৌধুরী(সম্পাদক), গোমতী, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সংখ্যা, তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ১৪০৩, পৃ. ১৫

Bibliography:

1. জিতেন্দ্র চন্দ্র পাল, ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, সৈকত প্রকাশন, আগরতলা, পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৪
2. ড. শিশির কুমার সিংহ, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশানস্ , আগরতলা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৮
3. হীরালাল চৌধুরী(সম্পাদক), গোমতী, তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, কার্ত্তিক ১৩৯৯
4. হীরালাল চৌধুরী(সম্পাদক), গোমতী, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সংখ্যা, তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, ১৪০৩

CC BY NC